প্রচলিত আহলে হাদিস ফিরকার ভ্রান্তি ও তার প্রতিকার

fff

প্রচলিত আহলে হাদিস ফিরকার ভ্রান্তি ও তার প্রতিকার

প্রচলিত আহলে হাদিস ফিরকার ভ্রান্তি ও তার প্রতিকার

মাযহাব মানার অপরিহার্যতা

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলিক দিকনির্দেশনার নামই হলো কুরআন-সুন্নাহ। সে আলোকেই হতে হবে মুসলমানের কর্মময় জীবনের বিন্যাস। ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন ও আন্তর্জাতিক জীবনসহ প্রত্যেক ক্ষেত্রে মৌলিক দিকনির্দেশনা ও পথচলার আলো এবং হিদায়াতের পথ বাতলে দিয়েছে কুরআন হাদীস। তবে কুরআন হাদীসে বর্ণিত উক্ত নীতিমালা ও দিকনির্দেশনা তথা শরয়ী বিধানগুলো বর্ণিত তিনভাবে।

১. সুস্পষ্ট।

২. অস্পষ্ট।

৩. শুধু মূলনীতি সম্বলিত বিধানসমূহ।

এই তিন প্রকারের প্রত্যেক প্রকারের ক্ষেত্রে সরাসরি নস (نص) থেকে শরয়ী বিধান বের করে তার উপর আমল করা সকলের জন্য সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। তাই একজন মুসলমান তার জীবনে ইসলামী শরীয়তের প্রতিটি বিধান সহজ থেকে সহজতর উপায়ে জেনে আমল করার জন্য ফুকাহায়ে কেরাম দীর্ঘ মুজাহাদা ও গভীর চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে রচনা করেছেন ইসলামী ফিকেহর বিশাল ভাণ্ডার। ফলে একজন সাধারণ মুসলমানের জন্য ফিকহী জ্ঞান বা কোনো মাযহাবের অনুসরণের মাধ্যমে ইসলামী শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভ করা সহজ হয়ে যায়। অথচ সরাসরি কুরআন হাদীস থেকে জ্ঞান লাভ করা একটি কঠিন সাধ্য বিষয়।

তিনভাবে বর্ণিত শরয়ী বিধানের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

১-কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত বিধানের নমুনা

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (البقرة:৪৩)

“তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর”। (সূরা বাকারা-৪৩)

উক্ত আয়াতে নামায আদায় ও যাকাত প্রদান করার বিধান সুস্পষ্ট। কিন্তু নামায আদায়ের নিয়ম-নীতি ও যাকাত প্রদানের পদ্ধতি ও বিবরণ আলোচনা করা হয়নি। কুরআনের অন্য কোথাও এর আলোচনা নেই। তাই ফকীহগণ এ ব্যাপারে বহু হাদীস অনুসন্ধান করে ইজতিহাদের আলোকে তা সমাধান করে দেয়ায় সাধারণ মুসলমানের জন্য সঠিকভাবে নামায আদায় ও যাকাত প্রদান সহজ হয়ে গিয়েছে। অথচ তার জন্য সরাসরি কুরআন হাদীস থেকে এসব বিধান অনুসন্ধান করে উদ্ভাবন করা অত:পর আমল করা শুধু কঠিনই নয় বরং রীতিমত অসাধ্যও বটে। সুতরাং সুস্পষ্ট বিধানের ব্যাপারে অবস্থা এরকম হলে অস্পষ্ট বিধানের ক্ষেত্রে তা কতটুকু কঠিন হবে তা বলা বাহুল্য।

২- কুরআনে অস্পষ্ট বিধানের নমুনা **www.eelm.weebly.com**

কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما (البقرة-١٥٨)

নিশ্চয় ছাফা-মারওয়াহ পাহাড় দুটি আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্যতম। সুতরাং হজ-উমরা পালনকারীদের এই পাহাড়দ্বয়ের সাঈ করতে কোনো অসুবিধা নেই।

উক্ত আয়াতে সাফা ও মারওয়া সাঈ করার বিধান অস্পষ্ট। অর্থাৎ বৈধ নাকি ওয়াজিব? তা বলা হয়নি। তবে হযরত উরওয়া কর্তৃক মা আয়েশা রা. থেকে জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে তার বিধান সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সাঈ শুধু মুবাহ নয় বরং ওয়াজিব। যেমনটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে বুঝা যাচ্ছিল। কেননা, জবাবে হযরত আয়েশা রা. বলেন উরওয়া তুমি যেমন বলতে চাচ্ছ সাঈ মুবাহ, ঘটনা যদি তাই হতো তাহলে তো কুরআনে এভাবে বলা হতো যে, সাঈ না করলে সমস্যা নেই অর্থাৎ- فلا جناح عليه أن لا يطوّف بهما অথচ কুরআন সেভাবে বলেনি।

৩- কুরআনে মূলনীতি সম্বলিত বিধানের নমুনা

যে সকল প্রাণীর গোশ্ত হারাম সবগুলোর নাম পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি বরং এ ব্যাপারে একটি মূলনীতি উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। আর তা হলো-

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (سورة الاعراف: ١٥٧)

"আর তিনি তাদের উপর নিকৃষ্ট জিনিস হারাম করেছেন"। (আ'রাফ:১৫৭)

উক্ত আয়াতটি কেবল একটি মূলনীতি। যার মাধ্যমে সকল অপবিত্র নিকৃষ্ট প্রাণী ভক্ষণ করা হারাম প্রমাণীত হয়; কিন্তু কোন কোন প্রাণী হারাম তা কুরআনে না থাকায় উক্ত মূলনীতিকে ফিকাহবিদগণ হাদীসের ভাণ্ডারে দীর্ঘ অনুসন্ধান ও ইজতিহাদ করে কোন কোন প্রাণী খাওয়া হারাম তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

সুতরাং মুজতাহীদ ইমাম ও ফকীহগণ যদি এ কাজটুকু না করতেন তাহলে সাধারণ মুসলমানের বেলায় হালাল-হারামের ব্যবধান করাও সম্ভবপর ছিলো না।

উপরোক্ত আলোচনায় একথা পরিষ্কার হলো যে, সাধারণ মুসলমানের জন্য প্রকৃত অর্থে কুরআন-হাদীস বুঝা এবং তার উপর আমল করা একজন ইসলামী পণ্ডিত ও জ্ঞানতাপস বা কোনো মাযহাবের অনুকরণ-অনুসরণ ব্যতিরেকে কখনো সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

فاسئلوا أَهْلَ الذكر إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (انبياء: ٧٨)

তোমরা যারা জানো না, যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও।(আম্বিয়া : ৭৮)

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে ইসলামী ফিক্হ বা জ্ঞান কুরআন হাদীস বহির্ভুত কোন নতুন বিষয় নয়; বরং কুরআন হাদীসের সার সংক্ষেপ বা নির্যাস, আর এরই নাম ফিকহ। কারণ, ফকীহগণ তাদের প্রত্যেকটি কথাই কুরআন হাদীসের কোন না কোন ‘নস’ তথা দলীলের আলোকেই বলেছেন। অতএব, প্রকৃত অর্থে মাযহাব অনুসরণ করা মানে কুরআন ও হাদীসেরই অনুসরণ করা। যারা “ফিক্হ শুধু ইমামগণের মনগড়া কিছু কথা মাত্র” উক্তি করে তারা জ্ঞানীর মুখোশ পরিহিত মূর্খ বৈ কিছু নয়।

কুরআন হাদীস থেকে ফকীহদের ফিকাহ্ উদ্ভাবনের পদ্ধতি

মুজতাহিদ ইমামগণ (ইজতিহাদী বিষয়ে) প্রথমে অনুসন্ধান করতে হয় কুরআনুল কারীমে। কুরআনের সরাসরি বর্ণনায় যদি বিধানটি পাওয়া যায় তাহলে তারই ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এটাকে বলে (صراحة النص) অর্থাৎ সুস্পষ্ঠ বিধান।

আর যদি এমন কোন বিষয় বর্ণিত হয়, যার অর্থ বোধগম্য হওয়ার ক্ষেত্রে একটি বিষয় উহ্য মানতে হয় অত:পর তারই আলোকে বিষয়টি বোধগম্য হয় তাহলে সে ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দিতে হবে। একে বলা হয় (اشارة النص) অর্থাৎ ইঙ্গিতবহ বিধান।

আর যদি ইঙ্গিতে বর্ণিত না থাকে তবে যদি কুরআনের বর্ণনা থেকে ষিয়টি বোধগম্য হয় তাহলে তারই ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দিতে হবে। একে বলা হয় (دلالة النص) অর্থাৎ সাংকেতিক বিধান।

আর যদি এমন কোন বিষয় বর্ণিত হয় যার অর্থ বোধগম্য হওয়ার ক্ষেত্রে একটি বিষয় উহ্য মানতে হয় অত:পর তারই আলোকে বিষয়টি বোধগম্য হয় তাহলে সে ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দিতে হবে। একে বলা হয়: (اقتضاء النص) অর্থাৎ চাহিদা সম্বলিত বিধান।

আর যদি এসব পদ্ধতির কোন পদ্ধতিতে বিধানটি পাওয়া না যায়, তাহলে হাদীসে রাসূলে উপরোক্ত কোনো প্রক্রিয়ায় বিষয়টি খোঁজতে হবে। যদি সেখানে উপরোক্ত কোনো প্রক্রিয়ায় বিষয়টি পাওয়া যায় তাহলে সে ভিত্তিতেই সমাধান দিতে হবে। হাদীসেও যদি বিষয়টি না পাওয়া যায় তাহলে অনুসন্ধান করে দেখতে হবে যে, সাহাবায়ে কিরামের এ ব্যাপারে ইজমা তথা সর্বসম্মত মতামত রয়েছে কিনা। থাকলে সে ভিত্তিতে সমাধান দিতে হবে ইজমাও না পাওয়াগেলে তখন কুরআন ও হাদীস তথা ইসলামী দলীলের আলোকে কিয়াস ও ইজতিহাদের মাধ্যমে তার সঠিক সমাধান করতে হবে।

এবার বলুন এপদ্ধতি অবলম্বন করে কোনো বিধান উদ্ভাবন করা অত:পর তার উপর আমল করা সব মুসলমানের পক্ষে সম্ভব?

কখনো না বরং এধরণের ইজতিহাদ করারমত বিজ্ঞ ব্যাক্তিগণেরই কাজ ইজতিহাদ করা। আর ইজতিহাদের অক্ষম ব্যক্তিদের কাজ মুজতাহিদ ইমামগণের ইজতিহাদ ও মাযহাবকে মেনে চলা। তবে কোনো কোনো বাতিল দল মাযহাবকে অস্বীকার করে, তাদের অন্যতম হলো আহলে হাদীস।

লা-মাযহাবী / আহলে হাদীসের পরিচয়

বর্তমানে মাযহাব, তাকলীদ, মুকাল্লিদ, গায়রে মুকাল্লিদ, সালাফী, লা-মাযহাবী এবং ইজতিহাদ ও মুজতাহিদ ইত্যাদি শব্দগুলো বহুল আলোচিত।

মূলত মাযহাব অর্থ চলার পথ। শরয়ী পরিভাষায় কুরআন সুন্নায় প্রদর্শিত এবং রাসূল সা. সিদ্দিকীন, শুহাদা ও সালিহীন কর্তৃক মনোনীত পথ কে বলা হয় মাযহাব। ভিন্ন শব্দে এটাকে বলা হয় সীরাতে মুস্তাকীম বা সরল পথ। যার লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা। ইরশাদ হচ্ছে-

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (لقمان :١٥)

"যে আমার অভিমুখী হয় তার পথ/ মাযহাব অনুসরণ করবে। অত:পর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারইদিকে তোমরা যা করবে সে বিষয়ে তোমাদেরকে জ্ঞাত করব"। (লুকমান:১৫)

কুরআন হাদীসের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জটিল বিষয়গুলোর যথার্থ সমাধান বের করত তা অনুসরণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে বরং এসব ক্ষেত্রে বিজ্ঞজনদের শরণাপন্ন হতে হবে। যারা তাদের বিজ্ঞচিত জ্ঞান দ্বারা এসব জটিল বিষয়ের সমাধান দেন তাদের নাম মুজতাহিদ/ ইমাম। তাদের গবেষনাসমূহকে বলা হয় ইজতিহাদ। মুজতাহিদ ইমামগণের সমাধান ও ব্যথ্যার অনুকরণ-অনুসরণ যারা করেন তাদেরকেই মুকাল্লিদ বলা হয়। আর এ অনুসরণের নাম হচ্ছে তাকলীদ। পক্ষান্তরে যারা বিজ্ঞচিত জ্ঞানের অধিকারীও নন তাই কোনো শরয়ী জটিল বিষয়ের সমাধান দেয়ার যোগ্যতা রাখেননা। আবার মুজতাহিদ ইমামগণের সমাধানকে অনুসরণ করতেও নারাজ বরং শিরক্ বা কুফর বলার দু:সাহস করে বসে এবং কুরআন ও হাদীস থেকে অজ্ঞ হওয়া সত্বেও সরাসরি বিধান আহরণের অসাধ্য ব্যার্থ চেষ্টা করে তারাই বর্তমানে গায়রে মুকাল্লিদ, লা-মাযহাবী, আহলে হাদীস ও সালাফী নামে পরিচিত।

আহলে হাদীসদের গোড়ার কথা

ভারত উপ-মহাদেশে মুসলমানদের স্বাধীনতা আন্দোলনে ফাটল সৃষ্টি কারী ইংরেজ বেনিয়ারা সর্বগ্রাসী আগ্রাসন বিস্তারে যে সকল ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছিল। তার মাঝে অন্যতম ছিলো তিনটি ভ্রান্ত দলের উদ্ভাস। যারা ইংরেজ সরকারের উকালতি করে ভারত উপ-মহাদেশের হক্কানী আলেমদের বিরোধিতায় ছিল সোচ্চার। এদের মধ্যে একদলের নাম 'আহলে হাদীস'। তারা প্রথমে 'মুহাম্মদী' নামে আত্মপ্রকাশ করে কিন্তু হকপন্থি উলামা ও জনগণ তাদেরকে 'লা-মাযহাবী', ওয়াহাবী ও 'গায়রে মুকাল্লিদ' নামে আখ্যা দেয়ায় ইংরেজ সরকার তাদের জন্য 'আহলে হাদীস' নামটি বরাদ্ধ করে। আকর্ষণীয় এ নামের আড়ালে তারা সরল মনা মুসলমানদের বিভ্রান্ত এবং দ্বিধাবিভক্ত করে বৃটিশ সরকারের লক্ষ অর্জনের গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

তাদের এ নামের ও মাযহাব বিদ্ধেষি মতাদর্শের সূত্রপাত কী করে হলো তার বিবরণ তুলে ধরেছেন 'মুযাহেরে হক্ব' গ্রন্থের লিখক আল্লামা কুতুবুদ্দিন তার 'তুহফাতুল আরব ওয়াল আজম' গ্রন্থে যার সারমর্ম নিম্নরূপ:

"সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ, মাওলানা ইসমাইল শহীদ এবং মাও আব্দুল হাই রহ. পাঞ্জাবে আগমন করার পরপরই কতিপয় বিভ্রান্তি সৃষ্টি কারীর সমন্বয়ে চার মাযহাবের ইমামগণের তাকলীদ অস্বীকারকারী নতুন ফিরকাটির সূত্রপাত লক্ষ করা যায় যারা 'শহীদানে বালাকোট' এর মুজাহীদ বাহিনীর বিদ্রোহী গ্র"পের সদস্য ছিল। এ ভ্রান্ত দলটির মুখপাত্র ছিল মৌলভী আব্দুল হক বেনারসী (মৃত: ১২৭৫হি:) সে কালে হারামাইন শরীফাইনের আইম্মাসহ সর্বস্তরের উলামায়ে হক্কানীগণ এক বাক্যে মাও. আব্দুল হক ও তার অনুসারীদেরকে পথভ্রষ্ট ও ভ্রান্ত দল বলে অভিহিত করেন। এখান থেকে লামাযহাবী আহলে হাদীস নামক নতুন মতবাদটির সুত্রপাত ঘটে। প্রাথামিক পর্যায়ে তারা ওয়াহাবী নামে পরিচিত ছিল, কিন্তু তারা নিজেদের 'মুহাম্মদী' বলে প্রচার করত। পরবর্তীতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা হারাম এ মর্ম্ েফাতওয়া দিয়ে ইংরেজদের দালাল হিসেবে চিহ্নিত হয়। এ সুযোগে তারা সরকারী কাগজ পত্রে ওয়াহাবী নাম রহিত করে আহলে হাদীস নামটি বরাদ্ধ করে নিতে সক্ষম হয়। লা-মাযহাবী এক আলেম মৌলভী মুহাম্মদ শাহজাহানপুরী (মৃত:৩৩৮হি:) তার নিজের মতাদর্শ সম্বন্ধে লিখেন:

"সম্প্রতি হিন্দুস্থানে এমন একটি অপরিচিত মাযাহাব পরিলক্ষিত হচ্ছে যার সম্বন্ধে জনসাধারণ মোটেই অবগত নয়। অতীতে এ মতাদর্শের কোনো লোক কোথাও ছিল কিনা তাতে সন্ধেহ আছে। উপরন্তু তাদের নামইতো মাত্র এখন শোনা যাচ্ছে। তারা

মুহাম্মদী বলে দাবী করছে কিন্তু প্রতিপক্ষ তাদেরকে গাইরে মুকাল্লিদ বা ওয়াহাবী অথবা লা-মাযহাবী বলে আখ্যায়িত করে থাকে"।(আল-ইরশাদ: পৃ:১৩)

উপরোক্ত আলোচনা প্রমাণ বহন করে যে, আহলে হাদীস জামাআতটি নব উদ্ভাবিত ভাতর বর্ষে গঠিত জিহাদ বিরোধী ইংরেজদের দালাল হিসেবে তাদের আবির্ভাব হয়েছে এবং এর প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে আব্দুল হক বেনারসী।

আহলে হাদীস দলটির উৎপত্তির রহস্য কি ?

এ ব্যাপারে আহলে হাদীসের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক নবাব সিদ্দিক হাসান খানের কয়েকটি উক্তি লক্ষ্যণীয়। তিনি তার তরজুমানে ওয়াহাবীয়া পুস্তিকায় লিখেন:

یہ ازادگی ہمارئے مذہب جدیدہ سے عین مراد قانون انگلیشیہ ہے۔

আমাদের নতুন মাযহাবে আযাদী (মাযহাব অমান্য করা) বৃটিশ সরকারী আইনের চাহিদা অনুযায়ী।

আহলে হাদীসের মুখপাত্র মিঞা নজির হুসাইন অন্যতম শিষ্য তরজমানে আহলে হাদীস মাও. মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভী লিখেন:

اس گروہ اہل حدیث کے خیر خواہ وفادار، رعایا، برٹش گوورمنٹ ہونے پر ایک بڑی روشنی اور قوی دلیل ہے کہ یہ لوگ برٹش گوورمنٹ کے زیر حمایت رہنے کو اسلامی سلطانوں کے زیر سایہ رہنے سے بہتر سمجھتے ہیں۔

ওই আহলে হাদীস দল বৃটিশ সরকারের কল্যাণ প্রত্যাশী, চুক্তি রক্ষাকারী ও অনুগত হওয়ার উজ্জল প্রমাণ হলো তারা বৃটিশ সরকারের অধীনে থাকা যে কোন ইসলামী সরকারের অধীনে থাকার চেয়ে উত্তম মনে করে। (আল-হায়াত: ৯৩)

তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার বিপক্ষে 'আল-ইক্তিসাদ ফী মাসাইলিল জিহাদ' নামক গ্রন্থও রচণা করেন। যাতে জিহাদ রহিত হয়ে গেছে বলে ফাতওয়া জারী করেন। (হিন্দুস্তান কী পহলী ইসলামী তাহরীক: ২১২)

আহলে হাদীসের মতাদর্শী আলেম আলতাফ হুসাইন লিখেন:

انگریزی گوورمنٹ ہندوستان میں ہم مسلمانوں کیلئے خدا کی رحمت ہے۔

হিন্দুস্তানে ইংরেজ গভ:মেন্ট আমরা মুসলমানের জন্য খোদার রহমত। (আল-হায়াত: ৯৩)

প্রিয় পাঠক বৃন্দ ! দেখুন, আহলে হাদীসের উৎপত্তির মূল রহস্য। কে নাজানে ইংরেজ আমলে ইসলাম ও মুসলমানদের করুণ কাহিনী, যেদিন সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকার এদেশের চৌদ্দ হাজার উলামা মুজাহিদ কে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে ছিল আর দিপান্তরের কঠিন বন্দিশালায় নিক্ষেপ করেছিল লাখো মুসলিম তাওহিদী জনতাকে। জ্বালিয়ে দিয়েছিল তিন লক্ষ কুরআনের কপি। বারো হাজার মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়েছিল। আকাশ-বাতাশ প্রকম্পিত হচ্ছিল ইজ্জত হারা মা-বোনদের আর্তনাদে। তখনই (১৯৭২ সালে) শাহ্ আব্দুল আযীয দেহলভী রহ. কর্তৃক দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষিত হলো ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফাতওয়া। যে ফাতওয়ার বলে উলামা ও মুসলিম জনতা ঝাঁপিয়ে পড়েন আযাদী আন্দোলনের পবিত্র জিহাদে। শহীদ হন হাজার হাজার বীর মুজাহিদ। আর ঠিক এমনি এক করুণ মুহূর্তে আহলে হাদীস দাবীদার দলটির শীর্ষ নেতাদের সে ইংরেজ সরকারকে খোদার রহমত বলে আখ্যায়িত করা, জিহাদকে রহিত বলে ঘোষণা দেয়া, ইসালামী রাষ্ট্রের তুলনায় ইংরেজ সরকার কে অতি উত্তম মনে করা এসব কিসের প্রমাণ ?

এসব তথ্যাবলী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বৃটিশ কর্তৃক ভারতবর্ষের মুসলমানদের দ্বিধা বিভক্ত করত: তাদের আধিপত্য বিস্তার করার মান্সে সে সব ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছিল। এরই ফলে যেসব ভ্রান্ত দলের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল তাদের অন্যতম হচ্ছে 'আহলে হাদীস' নামের পথভ্রষ্ট এ দলটি।

আকীদাগত গোমরাহ ফিরকার সূচনা বনাম আহলে হাদীস

ইসলামী ইতিহাস সাক্ষী যে, সাহাবায়ে কিরামের যুগ পর্যন্ত আকীদা বিষয়ে কোনোরূপ মতভিন্নতা দেখা দেয়নি। আকীদাগত মতভিন্নতার সূচনা হয় তাবেয়ীর যুগে। সর্বপ্রথম জন্মলাভ করে চারটি ভ্রান্ত ফিরকা। এদের উদ্ভবের কারণ ও উৎস ভিন্ন ভিন্ন।

যেমন- ১. কিছু লোক হযরত আলী রা.-এর ভালোবাসায় সীমা ছাড়িয়ে যায়। এরাই পরবর্তীতে শীয়ানে আলী তথা শীয়া সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

২. কিছু লোক হযরত আলী রা. ও হযরত মুআবিয়া রা. উভয়ের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে আলাদা হয়ে পড়ে। এরা ইতিহাসে খারেজী নামে পরিচিত।

৩. কিছু লোক আমলের মর্যাদাকে এতটাই কমিয়ে ফেলেছে যে, তারা দাবী করে ঈমান থাকাবস্থায় কবীরা গুনাহ ক্ষতিকর কিছু নয়। এদেরকেই বলা হয় মুরজিয়া সম্প্রদায়।

৪. কিছু লোক আকল-যুক্তি ও বিবেককে কুরআন হাদীসের উপর প্রাধান্য দিয়ে বসে। এরাই পরিচিতি লাভ করেছে মু'তাযিলা সম্প্রদায় হিসেবে। এদের উক্তি হলো কুরআন-হাদীসের যেসব কথা আমাদের বিবেক গ্রহণ করবে তা আমরা মেনে নিবো। আর যা আমাদের বিবেক বিরুদ্ধ হবে সেগুলো অস্বীকার করা সম্ভব হলে অস্বীকার করবো। অন্যথায় তার ব্যাখ্যা আমাদের বিবেকের ভিত্তিতে করে আমল করবো।

এ কারণে দেখা যায় মু'তাযিলা সম্প্রদায় বিবেকের উর্ধ্বে কোনো বিষয় হাদীসে দেখা মাত্র তা অস্বীকার করে বসতো। তবে কুরআনের কোনো বিষয়ে এমনটি হলে অস্বীকার করতো না; বরং নিজেদের মতো করে মনগড়া ব্যাখ্যা দিতো। এদের সাথে আকীদাগত মতপার্থক্য ছিল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের যাদের প্রকৃত সালাফী বলা হয়।

বর্তমানের আহলে হাদীস প্রকৃত সালাফী নয়

আকীদার ক্ষেত্রে হক্বপন্থী জামাত তিনটি। ইমামও তিনজন।

১. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রা. যিনি মু'তাযিলাদের সাথে আল্লাহর গুনাবলী এবং আল্লাহর কালাম 'কাদীম' অনাদি বিষয়ে জিহাদ করে জেল-যুলুমের শিকার হয়েছেন। ইমাম আহমদ রা. ইন্তেকাল করেন ২৪১ হি. অতঃপর ইরাকে জন্মগ্রহণ করেন ইমাম আবুল হাসান আশ-আরী রা. তিনি নিজেও প্রথম মু'তাযিলা ছিলেন। পরে সে মতাদর্শ ছেড়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতে ফিরে আসেন এবং মু'তাযিলাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যান। তার ইন্তেকাল হয় ৩০৩ হিজরীতে। এরপর ট্রান্সঅক্্িরয়ানায় জন্মলাভ করেন ইমাম আবু মানসুর মাতুরীদী। তিনি মু'তাযিলাদের রুখে দাঁড়ান তার দেশে। তার ইন্তেকাল হয় ৩৩৩ হিজরীতে।

এ তিনজন ইমামই প্রায় একই যুগের মানুষ। তাদের মধ্যে আল্লাহর বিশেষ গুনাবলীর ব্যাপারে ব্যাখ্যার পথ অবলম্বন করা বা না করা নিয়ে সামান্য মতবিরোধ থাকলেও সকলেই ছিলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত।

হ্যাঁ, আহমদ বিন হাম্বল রা. এর পর হাম্বলী অনুসারীগণ কিছু বাড়াবাড়িতে লিপ্ত থাকায় মতবিরোধের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সারকথা, ১. ইমাম আহমদ বিন্ হাম্বল ইসলামী আকীদার ক্ষেত্রে যে পথ অবলম্বন করেছিলেন এবং পরবর্তীতে তার অনুসারীগণ যা কিছু বাড়াবাড়ির শিকার হয় পরবর্তী সময়ে তারই নাম পড়ে যায় "সালাফিয়্যত"।

২. আর ইমাম আবু মানসুর মাতুরীদীর গৃহীত পন্থা পরিচিতি লাভ করে "মাতুরীদিয়া" হিসাবে।

৩. এদিকে ইমাম আবুল হাসান আশআরী রা.-এর চিন্তধারা লাভ করে "আশআরীয়া" হিসাবে।

প্রকৃত সালাফী আশআরী-মাতুরিদী সকলই আহলে হক

মোদ্দা কথা, (প্রকৃত) সালাফী ও আশআরী এবং মাতুরিদী আহলে হক এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত কারণ, এই তিন জামাতের মধ্যে প্রকৃত অর্থে কোন সংঘাত নেই তবে বর্তমান প্রচলিত যে সালাফী সম্প্রদায় রয়েছে এরা কিন্তু হক পন্থী নয়। কারণ, এরা চরম পর্যায়ের শিরক করে। তাই ইমাম মালেক রাহ. ইমাম সুফিয়ান এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. পর্যন্ত এরা হলেন প্রকৃত সালাফী এবং এদের সাথে আশআরী, মাতুরিদীদের সংঘাত না থাকায় প্রকৃত অর্থে আশআরী ও মাতুরিদীরাও সালাফী।

একজন লোক একই সাথে আশআরী এবং মাতুরিদী এবং সালাফী হতে পারে কেননা, মূল আকীদা এদের সকলেরই এক ও অভিন্ন। ব্যাখ্যার পন্থা অবলম্বন করা না করার ক্ষেত্রে যদিও কিছুটা বিরোধ আছে কিন্তু কোনো একটি কে জরুরী মনে না করার বরং উভয় পন্থার প্রত্যেকের নিকট অবকাশ থাকায় সবার ক্ষেত্রে সালাফী বলা যথার্থ। তবে স্মরণ রাখতে হবে ওই সালাফী কিন্তু এই সালাফী নয় হক ও বাতিলে যত ব্যবধান প্রকৃত সালাফী আর বর্তমান সালাফীর মধ্যেও তত ব্যবধান।

এ সালাফীদল ওই সালাফীদল নয়।

দীর্ঘ আলোচনায় প্রমাণীত হলো যে, আকীদার ক্ষেত্রে হকপন্থি জামাত তিনটি। যথা: ১. আশায়েরা ২. মাতুরিদীয়া ৩. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল পর্যন্ত সালাফী জামাত।

উল্লিখিত তিনটি জামাতই হক। এর বাইরে যারা আছে তারা গোমরাহ, পথভ্রষ্ট। ইবনে হাম্বলের পর যারা বাড়াবাড়ির শিকার। এর সীমালংঘনকারী যেমন বর্তমান কালের আহলে হাদীস, যার বানী আব্দুল হক বেনারসি, মৌলভী নযীর হুসাইন, মো. হুসাইন বাটালভী গং তারা ওই সালাফী নয় বরং গোমরাহ।

সুতরাং প্রমাণ হলো, প্রকৃতপক্ষে আমরা সালাফী আহলে হক। আর বর্তমান সালাফী দাবীদার যারা তারা সীমালঙ্ঘনকারী গোমরাহ।

অন্যদিকে ফিকহের ক্ষেত্রে হক জামাত হলো চারটি : হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী।

সুতরাং আকায়িদ ও ফিকহ উভয় ক্ষেত্রে যারা হকের অনুসারী প্রকৃত পরিপূর্ণ হকপন্থি জামাত আকায়িদের ক্ষেত্রে আশআরী, মাতুরিদী কিংবা প্রকৃত সালাফী হবে। আর ফিকহের ক্ষেত্রে হবে হানাফী,মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী।

যে ব্যক্তি আকীদা ও ফিক্হ উভয় ক্ষেত্রে উল্লিখিত জামাতগুলোর কোনো একটার অনুসারী হবে সেই হবে হকপন্থি। পক্ষান্তরে যদি এক ক্ষেত্রে হক হয় আর অন্য ক্ষেত্রে হয় গোমরাহ তাহলে সে পরিপূর্ণ আহলে হক হলো না। আর যে উভয় ক্ষেত্রে হবে ভিন্নমতাবলম্বি সে সুষ্পষ্ট গোমরাহ বলে গণ্য হবে।

বর্তমান আহলে হাদীস সম্প্রদায় আকীদার ক্ষেত্রে উপযুক্ত তিন জামাতের কোন জামাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হলো। আবার ফিকেহর চার জামাতেরও তারা অন্তর্ভুক্ত নয় কারণ তারা মাযহাব মানাকে শিরক ও বিদআত বলে।

সুতরাং তারা সুস্পষ্ট গোমরা পথভ্রষ্ট দল বলে সাব্যস্ত হলো।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এ জাতীয় ভ্রান্ত দলের চক্রান্ত থেকে হিফাজত করুন।

আহলে সুন্নাত ও আহলে হাদীসের সংজ্ঞা ও পার্থক্য কী

ইসলামী ইতিহাসে একটি গোষ্ঠী রয়েছে যারা নিজেদের 'আহলে কুরআন' বলে আরেক গোষ্ঠী দাবী করে তারা 'আহলে হাদীস' আর আমরা বলি আমরা 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত'।

যারা 'আহলে কুরআন' তারা কুরআনের পরে অন্য কিছু মানে না তাই তারা হাদীসও মানে না।

যারা 'আহলে হাদীস' তারা কুরআন ও হাদীস পর্যন্ত মানে সুন্নাহ-সাহাবা ইজমা কিয়াস মানে না।

আর আমরা কুরআন সুন্নাহ, সুন্নাতে সাহাবা তাবেঈন, ইজমা, কিয়াস মানি বিধায় আমরা "আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ"।

আমরা সবাই কুরআন ও হাদীসের পার্থক্য জানি বুঝি কিন্তু অনেকে আমরা হাদীস ও সুন্নাহর মাঝে কী পার্থক্য তা জানি না।

এ বিষয়টি জানার উপরই নির্ভর করে যেকোনো মুসলমান 'আহলে হাদীস' হতে পারে না। হ্যাঁ, আহলে সুন্নাহ হওয়া অপরিহার্য।

হাদীস ও সুন্নাহর পার্থক্য

হাদীস: চারটি বিষয়ের সমন্বয় হলো হাদীস

১। রাসূল সা. তাঁর জীবনে যা কিছু বলেছেন।

২। রাসূল সা. তাঁর জীবনে যা কিছু করেছেন।

৩। রাসূল সা. যে সকল বিষয়কে সমর্থন করেছেন।

৪। রাসূল সা. এর ব্যক্তিগত অবস্থা ও গুনাবলী।

এ চারটি বিষয়ের সমন্বিত রূপকে পরিভাষায় হাদীস বলা হয়।

সুন্নাহ: সুন্নাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো পথ। কুরআন, হাদীস, ফিকহের পরিভাষায় ভিন্ন ভিন্ন অর্থ থাকলেও হাদীসের পরিভাষায় সুন্নাহ শব্দের অর্থ হলো- الطريقة المسلوكة في الدين. মুসলমানদের জন্য অনুস্মরণীয় দীনের পথের নাম সুন্নাহ।

কুরআনে কারীমে এসেছে- قل هذه سبيلي ادعو الي الله. বলুন এটা আমার পথ আমি মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকি। (ইউসুফ:১০৮)

সারকথা উম্মতের জন্য অনুসরণীয় রাসূল সা. এর পথকে হাদীসের ভাষায় সুন্নাহ বলা হয়েছে।

সুতরাং হাদীস এবং সুন্নাহ শব্দ দুটি পরস্পর পরিপূর্ণরূপে স্বতন্ত্র বা বিরোধী নয় আবার সমার্থকও নয় ; বরং উভয় শব্দ কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভিন্ন অর্থাৎ কোনো কোনো জায়গায় হাদীস পাওয়া যায় কিন্তু সুন্নাহ থাকে না আবার কখনো সুন্নাহ পাওয়া যায় কিন্তু হাদীস থাকে না। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে হাদীস ও সুন্নাহ একই সাথে বিদ্যমান।

লক্ষ করুন, কোনো কোনো বর্ণনা বা কাজকে শুধু হাদীস বলা যায় কিন্তু সুন্নাহ নয় এমন বর্ণনার প্রকার তিনটি:-

ক. যেসব বর্ণনা, কাজ এক সময় শরীয়ত হিসেবে গৃহীত ছিল কিন্তু পরবর্তিতে তা রহিত হয়ে গেছে এগুলো হাদীসের আওতায় পড়ে কিন্তু সুন্নাত নয়। কারণ সুন্নত হলো উম্মতের জন্য অনুস্মরণীয় কাজকে বলে এগুলোর বিধান রহিত হয়ে যাওয়ায় তা আর অনুস্মরণীয় থাকে নি। যেমন:

* এক সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে – توضئوا مما مست النار‘‘’’

অর্থাৎ আগুনে রান্না করা বস্তু খাওয়ার পর তোমরা অযু কর। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এ বিধান আমাদের শরীয়তে বহাল থাকে নাই বরং রহিত হয়ে গেছে। তাই এটা হাদীস বলে মেনে নিতে হবে কিন্তু সুন্নত নয়।

* ইসলামের প্রথম যুগে মাসবুক ব্যক্তি মুসল্লিকে জিজ্ঞাসা করে জানতো কতো রাকাত তার ছুটে গেছে অতঃপর প্রথমে সে ছুটে যাওয়া রাকাত আদায় করে নিতো তারপর জামাতে শরীক হতো। হযরত মু'য়ায রা. একবার এর ব্যতিক্রম করলেন তিনি প্রথমেই জামাতে শরীক হলেন অবশিষ্ট নামায ইমামের সালাম ফেরানোর পর পড়লেন রাসূল সা. তা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি উত্তরে বলেন হুজুর আপনার জামাত ছেড়ে আলাদা একাকি নামায পড়া পছন্দ হয়নি। এ পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল স. বলেন- إنّ معاذا سنّ لكم سنة فاتبعواها‘‘’’

মু'য়ায তোমাদের জন্য একটি সুন্দর পথ রচনা করেছে তোমরা এই পথ অনুস্মরণ করো। বুঝা গেল প্রথম পদ্ধতিটা শুধু হাদীস কিন্তু সুন্নাত নয় মু'য়ায কতৃক আমলটিকে রাসূল সুন্নাত বলেছেন কারণ এটা অনুস্মরণীয় পূর্বের বিধান রহিত হওয়ায় তা সুন্নত বলা যায় না।

সারকথা, অনেক হাদীস হাদীসের কিতাবে সংরক্ষিত আছে কিন্তু এগুলোর বিধান রহিত হয়ে গেছে তাই এগুলোকে হাদীস তো বলতেই হবে কিন্তু সুন্নাত বলা যাবে না। সুন্নাত হচ্ছে ঐসব হাদীসের বিপরীত যেগুলো এসেছে সেগুলো যা চিরকাল অনুস্মরণীয় ও পালনীয়।

খ. যেসব হাদীস নবীজীর সাথে খাস/ নির্দিষ্ট।

যেসব হাদীস নবিজীর সাথে নির্দিষ্ট অন্য কারো জন্য তা পালনীয় নয়। নিঃসন্দেহে এগুলো হাদীস তবে সুন্নাত নয় কারণ উম্মতের জন্য তা অনুস্মরণীয় নয় । যেমন:- বিবাহর ক্ষেত্রে চারের কোনো শর্ত রাসূলের জন্য ছিলো না। এ কারণে রাসূল সা. এর ঘরে একই সাথে নয়জন স্ত্রী একত্রিত হয়েছেন এটা রাসূল সা. এর কাজ তাই নিঃসন্দেহে তা হাদীস তবে সুন্নাত নয়। উম্মতের জন্য অনুস্মরণযোগ্য আমল হচ্ছে এক সাথে চারজনের বেশী স্ত্রী রাখার অনুমতি নেই সুতরাং উপরোক্ত রাসূলের আমলটি অনুস্মরণীয় নয় বরং এটা নবিজীর সাথে খাস বা নির্দিষ্ট। এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে -

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ .... مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (سورة الاحزاب: ৫০)

হে নবী আমি আপনার জন্য আপনার বিবিগণ (যার সংখ্যা ৯) কে হালাল করেছি এই বিধান কেবলই আপনার জন্য। অন্য মুমিনের জন্য নয় (আহযাব-৫০)

গ. রাসূল সা. বিশেষ কোনো কারনে/ প্রেক্ষিতে কোনো কথা বলেছেন বা কাজ করেছেন উম্মতকে সাধারণ অবস্থায় তা অনুস্মরণ করার অনুমতি দেয়া হয়নি। তাই এগুলি অবশ্যই হাদীস কিন্তু সুন্নত নয়।

যেমন- মাগরিবের নামাযের পূর্বে নফল পড়া সুন্নত নয় বরং যাওয়া মাত্র যদি এর দ্বারা মাগরিবের নামায বিলম্বিত না হয় ।

حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة حدثني عبد الله المزني : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (صلوا قبل صلاة المغرب) . قال في الثالثة (لمن شاء) . كراهية أن يتخذها الناس سنة . (صحيح البخاري :৬/২৬৮১، رقم: ৬৯৩৪)

অর্থাৎ কেউ পড়তে চাইলে পড়তে পারবে কিন্তু তা সুন্নাত নয়।

হাদীসটি এসেছে একটি মাসআলা বুঝানোর জন্য তাহলো আসরের ফরযের পর নফল পড়ার নিষিদ্ধতা সূর্যাস্ত পর্যন্ত সূর্য ডোবার সাথে সাথে নফল মাকরূহ হওয়ার বিষয়টি আর অবশিষ্ট থাকে না সুতরাং এখন যদি কেউ সূর্যাস্তের পর নফল পড়তে চায় তাহলে পড়তে পারে তবে এসময় নফল পড়া সুন্নাত নয় তাই রাসূল সা. এবং খোলাফায়ে রাশেদাও মাগরিবের পূর্বে নফল পড়তেন না। বুঝা গেলো হাদীসটি এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে বর্ণিত হয়েছে তাই নিঃসন্দেহে হাদীস কিন্তু সুন্নাত নয়। হ্যাঁ সাহাবাগণ পরবর্তিতে মসজিদের খুঁটির আড়ালে দাঁড়িয়ে তা পড়তেন এর দ্বারা বৈধতাই বুঝায় সুন্নাত নয়।

* তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে পেসাব করা হাদীস তবে সুন্নাত নয় । কেননা হাদীসে এসেছে রাসূল সা. জীবনে একবার এক পতিত দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে পেসাব করেছেন তাই এটা অবশ্যই হাদীস কিন্তু সুন্নত নয়। সুন্নত হচ্ছে বসে পেসাব করা। কারণ নবিজী সা. সর্বদাই বসে পেসাব করেছেন। একবার দাড়িয়ে পেসাব করে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন স্থানটি আবর্জনাযুক্ত হওয়ার কারণে অথবা শারীকিক কোন সমস্যার কারণে বসতে অসম্ভব হলে তাব জন্য দাঁড়িয়ে পেসাব করার বিধান আছে।

* ঋতুকালীন স্ত্রীর সঙ্গ হওয়া হাদীস তবে সুন্নত নয়।

হাদীসে আছে রাসূল সা. আয়েশা রা. কে ঋতুকালীন সময়ে কাপড় জড়িয়ে তার সাথে শুয়ে পড়তে বলেছেন। এটা হাদীস এ মাসআলা বুঝানোর জন্য বর্ণিত হয়েছে যে, কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. (البقرة: ২২২)

তোমরা ঋতুস্রাবকালে স্ত্রী সঙ্গম বর্জন কর এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীদের নিকটে যেয়ো না। (বাকারা-২২২)

নিকট যেয়োনা কথাটা কিছুটা অস্পষ্ট এর ব্যাখ্যার প্রয়োজনে রাসূল সা. হযরত আয়েশা রা. কে সঙ্গে শুয়ায়ে বুঝালেন এতটুকু রাখা বৈধ। অবৈধ হচ্ছে সঙ্গম করা।

* সন্তান কোলে নিয়ে নামায পড়া হাদীস তা সুন্নাত নয়। হাদীসে এসেছে রাসূল সা. তার নাতনীকে কোলে নিয়ে জীবনে একবার পুরো নামায পড়িয়েছেন। সিজদার সময় মাটিতে বসিয়ে দিতেন উঠার সময় কোলে তুলে নিতেন নিঃসন্দেহে এটা হাদীস জীবনে একবার এ কারণে তা করেছেন যাতে কোনো উম্মতের ক্ষেত্রে বাচ্চাকে পাশে রেখে নামায পড়া কোনো পরিস্থিতির কারণে অসম্ভব হয়ে পড়লে সে যেন বাচ্চা কোলে নামায আদায় করতে পারে। তাই বলে এটা সুন্নত নয় যে সকলেই সাওয়াবের আশায় বাচ্চাকোলে নিয়ে নামায আদায় করবে এবং এ হাদীসকে সবসময় অনুস্মরণ করবে।

* উচ্চ শব্দে আমীন বলা হাদীস দ্বারা প্রমাণীত তবে সুন্নাত নয় সুন্নাত হচ্ছে নিম্ন শব্দে আমীন বলা। হযরত ওয়াইল স্বশব্দে আমীন বলার বর্ণনাকারী তিনি ইয়ামান থেকে মদীনায় আসেন ২০ দিনে রাসূল সা. এর সঙ্গে প্রথম কাতারে নামায পড়েন। ২০ দিনে জাহারী নামাযের সংখ্যা দাড়ায় ৬০ ওয়াক্ত, হাদীসের বর্ণনায় মাত্র তিন বার আমীন স্বশব্দে আমীন বললেন এতে কী বুঝাতে চেয়েছেন? 'কিতাবুল আসমা ওয়াল কুনাতে' আল্লামা দাওলাবী বর্ণনা করেন যে, হযরত ওয়াইল স্বয়ং কারণ উল্লেখ করেন যে,

(ما اراه الا ليعلمنا. (كتاب الاسماء والكنت

আমার ধারণা রাসূল সা. স্বশব্দে (তিন ওয়াক্ত) আমীন বলেছেন আমাকে শেখাবার উদ্দেশ্যে غير المغضوب عليهم، ولاالضالين. আমীন বলতে হয়।

সুতরাং প্রমাণ হলো যে আমীন স্বশব্দে বিশেষ উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল তাহলো নতুন সাহাবীকে শিক্ষা প্রদান এতে জায়েয প্রমাণীত হলেও সুন্নাত প্রমাণীত হয় না। এ কারণে হানাফী ইমামগণ নিম্নস্বরে পড়াকে সুন্নত বলেছেন। যদিও স্বশব্দে পড়াও জায়েয তবে চিৎকার করে রাসূল আমীন বলেননি যা বর্তমানে তথাকথিত "আহলে হাদীসরা"করে থাকে।

সারকথা: তিন ধরনের বর্ণনা/ রেওয়ায়েতকে কেবল হাদীস বলা যায় তবে সুন্নাত বলা যায় না।

(১) যে সকল হাদীস মানসূখ ও রহিত হয়েগেছে।

(২) যে সকল হাদীসের সম্পর্কে কেবলই রাসূল সা. এর সাথে নির্দিষ্ট।

(৩) যে সকল কথা বা কাজ রাসূল সা. কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছে বিশেষ কোন কারণ বসত কিংবা কোন মাসআলা বুঝানোর উদ্দেশ্যে।

এবার দেখা যাক যেসব বিষয় কেবল সুন্নাত তবে হাদীস নয়

যেমন খোলাফায়ে রাশেদীনের পথ কর্ম সিদ্ধান্তসমূহ এগুলো সুন্নাত তবে হাদীস নয় কারণ হাদীসতো রাসূল সা.-এর 'কথা, কাজ, সমর্থন' কে বলে এগুলোতো সাহাবায়ে কিরামের 'কাজ, কথা' এ অর্থে হাদীস বলা যায় না কিন্তু সকল উম্মতের জন্য এগুলি অনুস্মরনীয় বিধায় এর অন্তর্ভুক্ত তাই এগুলো সুন্নাত।

এমর্মে রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ.

তোমাদের (উম্মত) উপর আমার সুন্নাত এবং সত্য পথ প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতের অনুস্মরণ অবশ্য কর্তব্য। তোমরা এ সুন্নাতকে শক্তভাবে আকড়ে ধর।

মোট কথা, চার খলীফার সিদ্ধান্ত ও কর্মগুলো শুধু সুন্নত হাদীস নয়। যেমন: খলীফা আবু বকরের সুন্নত: যেসব মুসলমান কেন্দ্রীয় সকরারকে যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন কেননা যে সকল বিষয় ইসলামের প্রতীক যদিও তা সুন্নাতের স্তরে পড়ে। যদি তা কোনো গোষ্ঠী একসাথে বর্জন করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ এটা সুন্নতে সিদ্দিক রা.। যেমন খৎনা করা, আযান দেয়া সুন্নত তবে ইসলামের নিদর্শন হওয়ায় কোনো গোষ্ঠী তা একসাথে বর্জন করলে

সরকার যুদ্ধ করে হলেও তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেয়া জরুরী। তেমনিভাবে জিবদ্দশায় পরবর্তী খলীফা নির্বাচন করা সিদ্দিকী সুন্নাত।

খলীফা ওমর রা. এর সুন্নত: যেমন এক মজলিস বা একই শব্দে প্রদত্ত তিন তালাক তিন তালাক বলেই বিবেচিত হবে যদিও তা তাকীদের নিয়তে বলার দাবী করা হোক।

* ইরাক যুদ্ধের পর সে জমি-জমা মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন না করে বাইতুলমালে জমা করে এতিম দুস্থদের প্রদানের সিদ্ধান্ত।

* মুসলিম রাষ্ট্রে চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমদের কর বা জিযিয়ার পরিমাণ নির্ধারণ করণ।

* তারাবীর নামায জামাতের সাথে বিশ রাকাত পড়ার সিদ্ধান্ত এসবগুলো সুন্নতে ওমরী। তবে হাদীস নয়।

খলীফ উসমান রা. এর সুন্নাত: জুমআর নামাযের পূর্বে একটি আযান বৃদ্ধি করণ। কুরআনুল কারীম কুরাঈশদের ভাষায় এ নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে মতভিন্নতা ও বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ায় উসমান রা. আবার সকলকে কুরাইশী ভাষার উপরে দাঁড় করিয়েছেন। এগুলো উসমানী সুন্নত।

খলীফা হযরত আলীর সুন্নত: যেমন মুসলামানদের মধ্যে যদি পরস্পরে লড়াই বাধে তাহলে বিজিতদের সম্পদ গনীমতের সম্পদ বলে বিবেচিত না হওয়ার সিদ্ধান্ত এবং বন্দিরাও হবে না দাস-দাসী যেমনটি কাফেরদের সাথে যুদ্ধ হলে তাদের মাল হয় গণীমতের অন্তর্ভুক্ত বন্দিরা হয় দাস- দাসী।

এবং এ বিধানটি জামাল যুদ্ধের ঘটনাতে পরাজিতদের মধ্যে আম্মাজান হযরত আয়েশা রা.অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্ত হয়।

মোটকথা: খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে গৃহীত এসব সিদ্ধান্ত ও কর্মপন্থা এই উম্মতকে এবং ইসলামী শাসন ব্যবস্থাকে সুশৃংখল ও সুগঠিত করার লক্ষে নেয়া হয়েছিলো যা ছিলো হাদীসের দৃষ্টিতে অপরিহার্য।

আহলে হাদীস ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পার্থক্য

এই দীর্ঘ আলোচনায় প্রমাণ হয় যে, রাসূল সা.-এর এ ধরনের বর্ণনা প্রচুর। আবার অনেক বর্ণনা শুধু হাদীস তবে তার বিধান পালন রহিত, বৈশিষ্ট্য বিশেষ কারণে হওয়ায় তা হাদীস হলেও সুন্নাত নয়। আর বহু বিষয় সুন্নাত সকল উম্মতের জন্য অনুস্মরণযোগ্য যেমন- চার খলীফার সুন্নাত এগুলো শুধু সুন্নাত তবে হাদীস নয়। উপরোক্ত বিশ্লেষণ বুঝে নিলে একথা দিবালোকের মতো পরিষ্কার যে, 'আহলে হাদীস' ও 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের' মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান। যেমন:
(১) আহলে হাদীস যেকোনো একটি হাদীস পেলেই আমল শুরু করে তা রহিত হোক বা নবিজীর বৈশিষ্ট্য হোক বা কোনো বিশেষ কারণে তা রহিত হোক অথচ এগুলো পালনিয় বিষয় নয়। আর আহলে সুন্নাত বিশ্বাস করে সব হাদীস কে কিন্তু মান্য করে যা মানার আদিষ্ট বা অনুস্মরণ অনুকরণ যোগ্য।

(২) আহলে হাদীস সাহাবা মানে না কারণ সাহাবাদের 'কথা,কাজ' হাদীস নয় বরং সুন্নাত অথচ তাঁরা হলেন আহলে হাদীস চার খলীফার সব সিদ্ধান্তকে তারা একই কারণে অমান্য করে। বর্তমান আহলে হাদীসগণের তারাবীর নামায ৮ রাকাত বলা তিন তালাক দিলে এক তালাক হবে বলা। জম'আর প্রথম আযানকে বিদ'আত বলা। আমীন স্বশব্দে-চিৎকার করে বলা ইত্যাদীর মূল রহস্য এটাই যে তারা সুন্নতই মানে না। পক্ষান্তরে রাসূল সা. এর সাথে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হাদীসগুলো আমল করার দুঃসাহস করেন। অন্যদিকে তারা জঈফ হাদীস ও মাউজু হাদীসকে একাকার করে সব অগ্রহণযোগ্য বলে উক্তি করে।

এসব কারণে কোনো খাঁটি মুসলমানের ক্ষেত্রে 'আহলে হাদীস' হওয়াও সম্ভব নয়।

কিন্তু "আহলে সুন্নাত (তথা নবীর অনুস্মরণযোগ্য হাদীস) ওয়াল জামাত", খলীফা সহ সকল সহাবাদের আদর্শের ভিত্তিতে যারা পরিচালিত তাঁরা খাটি মুসলমান নাজাতপ্রাপ্ত উম্মত।

এ সব কারণে রাসূলের হাদীসে সুন্নাহ আঁকড়ে ধরে আহলে সুন্নাত হওয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তবে হাদীসের উপর আমল বা অনুসরণ করার কথা কোথাও বলা হয়নি।

যেমন: ১) হাদীসে এসেছে- من تمسك بسنتي عند فساد امتي..الخ "যে আমার সুন্নাতকে মজবুত করে ধরবে যখন উম্মতের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি হবে"।

২) تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله.

৩) عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ.

আহলে হাদীস ভাইগণ একটি হাদীস পেশ করতে পাবেন না যে রাসূল সা. উম্মতকে হাদীস মজবুত করে আঁকড়ে ধরতে বলেছেন।

ভ্রান্ত 'আহলে হাদীসের' অপতৎপরতার প্রতিকার

যেকোন বিষয়ে মন্তব্য ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে হলে সে বিষয়ে পূর্ণরূপে জ্ঞাতি লাভ করতে হবে। কেননা, গভীরে না পৌঁছে কোন বস্তুর ইতিবাচক বা নেতিবাচক দিক আলোচনা-পর্যালোচনা করা সম্ভব নয়। তাই বর্তমান তথাকথিত 'আহলে হাদীস' নামধারী হাদীসের যথেচ্ছা অপব্যাখ্যাকারী ও স্বার্থান্বেষী ভ্রান্ত ও গোমরাহ দলটি সম্পর্কে আমাদেরকে সচেতন ও সজাগ থাকতে হবে। আর সচেতনতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রথমত- আমাদেরকে এ ভ্রান্ত দলটির বিশ্লেষণ পূর্বক তাদের নীতিমালা, মতাদর্শ, কার্যপ্রণালী, সমাজে তাদের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া, অপব্যাখ্যা সম্বলিত দলীলসমূহ সম্পর্কে জ্ঞাতি লাভ করতে হবে। দ্বিতীয়ত- 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত'-এর মতাদর্শ সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা অর্জন করা এবং কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সহীহ আকীদা সুবিন্যস্তভাবে জেনে ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস গুলোর যথাযথ জবাব দেয়া।

কেবল তখনই ভ্রান্ত দলগুলোর মুখোশ উন্মোচন ও তাদের ভ্রান্তিগুলো এবং সঠিক মতাদর্শ আপামর জনতার সামনে তুলে ধরা সহজ হবে। (ইন-শা আল্লাহ)

ভ্রান্ত দলগুলোর ভ্রান্তি নিরসনে নিম্নের ধাপগুলো যথোপযোগী

ক. বক্তৃতা, লিখনী ইত্যাদীর মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি। শহরে-বন্দরে, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে দীনের সঠিক বাণী পৌঁছে দেয়ার নিমিত্তে ওয়াজ-মাহফিল, বক্তৃতা-সেমিনার, বই-পুস্তক, প্রবন্ধ-স্মারকলিপি, পত্রিকা-ম্যাগাজিন,ব্যানার-ফেস্টুন, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার মাধ্যমে দীনি মাসআলা-মাসাইল, ঈমান-আকাইদ বিষয়গুলো প্রচার-প্রসার করা। বিশেষ করে সময়োপযোগী কার্যকরী পদক্ষেপ স্বরূপ ফেসবুক, ওয়েবসাইট ইত্যাদীও ব্যবহার করা যেতে পারে।

খ. ভ্রান্ত দলগুলোর মতাদর্শ বিচক্ষণতার সাথে বুঝে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তার জবাব দেয়া। বাতিল যেভাবে ভ্রষ্টতা বিস্তার করছে ঠিক সেভাবে আমাদেরও দলীল ভিত্তিক ভ্রষ্টতা দূরীকরণের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা অপরিহার্য। দলীল বিহীন শুধু যুক্তি ও প্রভাব প্রতিপত্তির মাধ্যমে তাদের সাথে লড়া কোনো বিবেকবানের কাজ নয়।

গ. সম্ভব হলে ভ্রান্ত দলগুলোকে আলোচনার সম্মুখিন করে লোকালয়ে তাদের মতাদর্শ শুনে কুরআন-সুন্নাহর ভাষ্যমতে ভ্রান্তিগুলো চিহ্নিত করে শুধরে নেওয়ার পন্থা বাতলে দেওয়া। প্রয়োজনে বিতর্ক অনুষ্ঠান, মুনাযারা, মুবাহাসা, শিক্ষা সেমিনার ইত্যাদীর ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

ঘ. সর্বস্তরে গণজাগরণ সৃষ্টি করা। সামাজিক, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ফলপ্রসু ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে সরকারী পর্যায়ে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত'-এর মাপকাঠি ও ভ্রান্ত দলগুলোর ভ্রষ্টতা তুলে ধরা। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাতিল যেভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তাদেরকে রাষ্ট্রীয় ভাবে পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ স্বীকৃতি প্রদান, এমনকি বয়কট করার ব্যবস্থা গ্রহণ করাও সময়ের দাবী। সরকারের উচ্চপর্যায়ে এ দাবী উত্থাপনের জন্য সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায়ও এগুনো যেতে পারে। যেমন, বাংলাদেশের স্বনামধন্য, যোগ্য মুফতি, মুহাদ্দিস, ফকীহগণের সমন্বয়ে গঠিত 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত পরিষদ বাংলাদেশ' নামে একটি ঈমান-আকীদা সংরক্ষণকারী সংগঠন রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে উপরোক্ত আলোচনা সঠিকভাবে অনুধাবন করে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জীবন যাপন করার তাওফীক দান করুন। আমীন